কংগ্রেসে নেতাজী

রমা ঘোষ

যে অদ্ভুত উন্মাদনা ও দুঃসাহসিকতায় নেতাজী দেশ থেকে দেশান্তরে পাড়ি দিয়ে ভারতীয় মুক্তি বাহিনী গড়ে তুলে ব্রিটিশকে প্রত্যক্ষ আঘাত হানতে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁর জীবনের এই রহস্যাবৃত শেষ অধ্যায়ের স্বল্প তথ্যও তাঁকে আগুনের মত ভাস্বর করে রেখেছে জাতির স্মৃতিতে, কারণ আমাদের ইতিহাসে তাঁর এই শেষ ভুমিকার আর কোন দ্বিতীয় নেই—কারণ চিরকাল আবেগপ্রবণ, আদর্শবাদী ও বিশেষত: তরুণ মনকে এই দু:সাহসিক আত্মত্যাগের মত করে আর কিছুই নাড়া দিতে পারে না। কিন্তু এর আগেও দুই দশক ধরে ভারতের রাজনীতিতে তিনি অংশ নিয়েছেন, ও কংগ্রেসের সব থেকে গতিশীল একটা পর্যায়ের বিবর্তন ও অগ্রগতিতে একটা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছেন যার পরিণতিতে তাঁর কংগ্রেস থেকে বহিস্কার। কিন্তু এই অস্বস্তিকর ও বিতর্কিত ঘটনার পিছনের দীর্ঘদিনের পটভূমি ও সেখানে কে কোথায় দাঁড়িয়ে তা অনেকেরই অজানা।

সুভাষের প্রথম কংগ্রেসে যোগদান একজন পথসন্ধানী তরুণ হিসেবে, যে তার সমস্ত শক্তি ও উদ্যম দেশের স্বাধীনতা অন্দোলনে নিয়োগ করতে চায়। গান্ধীজী ? অসহযোগের আহ্বানে প্রথম পথ খুঁজে পেয়ে তিনি দেশে ফিরলেন কংগ্রেসের একজন সেবক হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে। কিন্তু প্রশ্নহীন আত্মসমর্পণ নিয়ে নয়। প্রথমেই তিনি কংগ্রেসের ও আন্দোলনের লক্ষ্য ও প্রতিটি ধাপ সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা চাইলেন। তাঁর প্রশ্ন ছিল কীভাবে কেবলমাত্র কর বন্ধ বা আইন অমান্য দ্বারাই সরকারকে স্বাধীনতাদানে বাধ্য করা সম্ভব, ও 'এক বছরের মধ্যে স্বরাজ' কীভাবে আসবে। গান্ধীজীর সংগে আলোচনার শেষে সুভাষ হতাশ হয়ে অনুভব করলেন আন্দোলনের পরিকল্পনার স্পষ্টতার শোচনীয় অভাব ও ভারতের ঈপ্সিত স্বাধীনতা এখনও সুদূর।

এরপর বাস্তব রাজনীতিতে শিক্ষানবীশী সুরু হল দেশবন্ধুর শিষ্য হিসেবে। দেশবন্ধুর আক্রমণাত্মক রাজনীতি, তীব্র জাতীয়তাবাদ, স্পষ্টতর কর্মসূচী তরুণ সুভাষের বিদ্রোহী মনকে আকৃষ্ট করেছিল। কলকাতা ন্যাশনাল কলেজ, স্বরাজ পত্রিকা, বাংলা প্রদেশ কংগ্রেসের প্রচারে কাজ দিয়ে শুরু করে প্রিন্স অব্ ওয়েলস—এর সফর বর্জন আন্দোলনে অচিরে বিখ্যাত সুভাষ দেশবন্ধুর স্বরাজ নীতির একজন প্রধান প্রবক্তা ও স্বরাজ দলের প্রধান সংগঠক হয়ে একেবারে ভারতীয় রাজনীতির সামনের সারিতে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু তবুও একটা অস্থিরতা তাঁর ভিতরে কাজ করছিল যে জন্য স্বরাজ দলের শাসনতান্ত্রিক রাজনীতির মধ্যে জড়িয়ে থেকেও সুভাষ বাংলার বিপ্লবীদের সংগে যোগাযোগ করছিলেন যার পরিণাম ১৯২৪ —এর শেষে গ্রেফ্তার ও নির্বাসন। দুবছর পর যখন মুক্তি পেলেন ততদিনে লক্ষ্য তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে ঃ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও পরিকল্পিত অর্থনীতি ও এর জন্য অপোষহীন লড়াই। গান্ধীজী ও দেশবন্ধু দুজনের চিন্তা থেকেই সরে এসে তিনি এক বৈপ্লবিক বামপন্থার পথ নিলেন।

সে সময় জাতীয় অর্থনৈতিক দুর্দশা ও পাশাপাশি রুশ বিপ্লব এবং এম, এন, রায় ও কমিন্টার্ণের উদ্যোগে প্রচারিত পত্র পত্রিকা কংগ্রেসের ভিতরে, বিশেষত: তরুণদের মধ্যে একটা অস্থিরতা তৈরী করছিল যারা 'স্বরাজে'র অস্পষ্ট লক্ষ্যে আর সন্তুষ্ট হতে পারছিল না। সুভাষ এই অস্থিরতাকে একটা সদর্থক পথে নিয়ে আসবার কাজে লাগলেন। সে সময়ে জওহরলালও ইউরোপ থেকে ফিরেছেন সদ্য সমাজতন্ত্রের দীক্ষা নিয়ে। দুই তরুণ নেতা যৌথভাবে কংগ্রেসকে একটা নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্যে নিয়ে আসবার জন্য অবিরত প্রচারের মাধ্যমে দলে পূর্ণ স্বাধীনতা ও পরিকল্পিত অর্থনীতির চিন্তা সঞ্চারিত করতে লাগলেন। দলে একটা বামপন্থী স্রোত শক্তিসংগ্রহ করতে লাগল যার প্রথম সাফল্য ১৯২৭এর মাদ্রাজ কংগ্রেস, যখন সাইমন কমিশন

সংক্রান্ত উত্তেজনার মধ্যে তারা পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিল। কিন্তু এই প্রাথমিক সাফল্যের মধ্য দিয়েই কংগ্রেসে এক দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্বের সূচনা হ'ল, যেখানে একদিকে রক্ষণশীল নেতৃত্ব, অপরদিকে বামপন্থী তরুণ সম্প্রদায়। এবং এই দ্বন্দ্বে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সুভাষের ভূমিকার মধ্যে কোথাও অস্পষ্টতা বা আপোষ নেই, আর সেই জন্য এই দ্বন্দ্বের চরম পরিণতি তাঁর বহিস্কারে।

পরের বছর কলকাতা অধিবেশনেই দেখা গেল রক্ষণশীল নেতৃত্ব আবার 'পূর্ণ স্বাধীনতা–র বদলে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস–এর লক্ষ্যে দলকে ফিরিয়ে নিতে যেতে চায়। সুভাষ ও জওহরলাল কলকাতায় নেতৃত্বের কাছে হেরে গেলেন। পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করে সুভাষের আনা প্রস্তাব ভোটে পরাজিত হ'ল। কিন্তু পরাজয়ের তিক্ততা তাঁদের নিশ্চেষ্ট করেনি। 'স্বাধীনতা লীগ' গঠন করে তাঁরা দলের মধ্যে ক্রমাগত প্রচার ও চাপ সৃষ্টি করে চললেন। ১৯২৯–এ অবশেষে ভিতরের ও বাইরের পরিস্থিতির চাপে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য গ্রহণ করল। কিন্তু অচিরেই গান্ধী–আরুইন চুক্তি সমর্থন করে' ৩১–এর করাচী কংগ্রেস যখন কার্যতঃ আবার ব্রিটিশের নাক গলানোর অধিকার মেনে নিল তখন প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিলেন সুভাষ, এবং অনেকটা এই বিক্ষুব্ধ বাম গোষ্ঠীকে খানিকটা শান্ত করার জন্যও করাচীতে 'মৌলিক অধিকার ও অর্থনৈতিক নীতি'র বিখ্যাত প্রস্তাব নেওয়া হয়। চুক্তির তীব্র সমালোচনা করলেও সুভাষ কংগ্রেসের ভিতরে অনৈক্য সৃষ্টি করতে চাননি, যেজন্য মতভেদ সৃষ্টি করা থেকে বিরত ছিলেন।

কিন্তু পরবর্তী দিনে ঐক্য সম্পর্কে তাঁর ধারণা বদলে যায়। তিনি বলেছেন ঐক্য যদি অগ্রগতির সহায়ক হয় তবেই তা যথার্থ, অন্যথায় ঐক্য আরো পিছন দিকে ঠেলবে, –সেক্ষেত্রে ঐক্য বজায় রাখাই কাজের পক্ষে ক্ষতিকর। এক দশকের অভিজ্ঞতা ১৯৩৯–এ তাঁকে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। আইন অমান্য আন্দোলন দ্বিতীয়বার শুরু হবার সংগে সংগেই গ্রেফতার সুভাষ নির্বাসন থেকে শুনলেন আন্দোলন স্থগিত। হতাশায় তিনি বললেন, ''কংগ্রেস যদি না বদলায় তা হ'লে তার ভিতরে একটা নতুন প্রগতিশীল দল তৈরী হবে।" আন্দোলন অবসানের সংগে সংগেই কংগ্রেস আক্রমণের পথ পরিত্যাগ করে শাসন–তান্ত্রিকতার দিকে ঝুঁকল। যে সংবিধানের বিরুদ্ধে তার লড়াই ১৯৩৬ –এ দেখা গেল তার শর্ত অনুযায়ীই কংগ্রেস আসন্ন নির্বাচনে অংশ নিতে চলেছে। নেহেরু এই প্রবণতার বিরোধী, তিনি সুভাষের সাহায্য চাইলেন। কিন্তু দেশে ফেরা মাত্র গ্রেফ্তার হয়ে সুভাষ যখন মুক্তি পেলেন তখন ১৯৩৭–এর মার্চ নির্বাচনে কংগ্রেস সদ্য জয়লাভ করেছেন–মন্ত্রীসভা গঠন করা চলছে। সুভাষ ও জহললালের সমস্ত বিরোধিতা ব্যর্থ হ'ল। তাঁদের আশংকা ছিল মন্ত্রীসভা গঠন করলে কংগ্রেসের মধ্যে সংগ্রামের মানসিকতা নষ্ট হয়ে গিয়ে ব্রিটিশের সংগে সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি পাবে। বিক্ষুব্ধ বামপন্থীরা এ আশংকায় আরো বেশী বিদ্রোহী হয়ে উঠতে লাগল এবং বিভিন্ন ইস্যুকে কেন্দ্র করে তাদের সমালোচনা মুখর আক্রমণাত্মক ভূমিকা দক্ষিণপন্থীদের সংগে বারবার সংঘাত তৈরী করতে লাগল। এই সময় থেকে কংগ্রেসে আর একটা প্রবণতা দেখা দিল। বিশের দশক থেকে এতদিন পর্যন্ত বামপন্থীরা সংগঠিক হচ্ছিল, এবার তাদের প্রবল আক্রমণের মুখে দক্ষিণপন্থীরা সংহত হতে শুরু করল। নতুন প্রশাসনিক ক্ষমতার আস্বাদ পেয়ে তারা তখন স্থিতাবস্থার সমর্থক হয়ে উঠছে। স্বভাবত:ই সংগ্রামের জন্য উন্মুখ বামপন্থীদের সংগে তাদের আর মিল হচ্ছে না। অমিলটা অধিকাংশ বিষয়েই প্রতিফলিত। সি, এস, পি, সম্পর্কে বামপন্থীদের সোৎসাহ সমর্থন, আর এক দলের চরম বিরোধিতা; শ্রমিক কৃষক সংগঠনগুলির অনুমোদনের জন্য বামপন্থীরা উৎসুক, দক্ষিণ পন্থীরা কিছুতেই তাদের অনুমোদন দিতে রাজী নয়; দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের স্বার্থে লড়াই করবার জন্য বামপন্থীরা রাজ্যগুলিতে কংগ্রেসের কাজ করতে চায়, দক্ষিণপন্থীরা রাজাদের সমর্থন লাভের জন্য প্রজাদের কংগ্রেস থেকে দুরে রাখতে চায়, মন্ত্রীসভার কাজগুলি সম্পর্কে বামপন্থীরা আত্মসমালোচনায় মুখর, দক্ষিণপন্থীরা

আত্মসমর্থনে সচেষ্ট। এ সময় গান্ধীজী অবিসম্বাদি বামপন্থী নেতা সুভাষকে সভাপতি করে দুই দলের মধ্যে একটা ঐক্য আনবার চেষ্টা করলেন। সে সময় জনপ্রিয়তা ও গুরুত্বে সুভাষ কংগ্রেস রাজনীতির প্রথম সারিতে এবং কোনো কোনো অংশের কাছে সব থেকে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব।

১৯৩৮—এ সুভাষ কংগ্রেসের তরুণতম সভাপতি হলেন; যাঁর তীক্ষ্ণ মননশীলতা, বাস্তবজ্ঞান, আদর্শবাদ ও দক্ষ নেতৃত্ব, উদ্যম ও নির্ভীকতা দলের মধ্যে একটা নতুন গতিসঞ্চার করবার উপযুক্ত ছিল। এর সংগে যুক্ত হয়েছিল আপোষহীনতা ও সুদৃঢ় নিষ্ঠা। অথচ কংগ্রেসের রাজনীতি ছিল বরাবরই আপোষের রাজনীতি, বিভিন্ন শ্রেণী, স্বার্থ ও প্রবণতার মধ্যে অংক কষে কষে এগিয়ে চলা। তাই যে পথে একদিন তিলককে কংগ্রেস থেকে চলে যেতে হয়েছিল, সুভাষও সেই পথের দিকেই এগোতে লাগলেন।

সুভাষ সকলকে সংগে নিয়েই চলছে চেয়েছিলেন; কারণ কংগ্রেসের ঐক্যের প্রয়োজন তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু তাঁর রাজনীতির বৈশিষ্ট্য ছিল স্পষ্টতা, বলিষ্ঠতা ও আপোষহীন দৃঢ়তা যা তাঁকে ক্রমেই অনেকের কাছে অস্বস্তিকর অসহনীয় করে তুলছিল। যে বিষয়টিকে ঘিরে তাঁর সংগে দক্ষিণপন্থীদের মতবিরোধ সব থেকে প্রকট ছিল তা হল ১৯৩৫—এর আইনে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো যার উদ্দেশ্য ছিল ভারতের ঐক্য ও সংহতি নষ্ট করা যাতে করে স্বাধীনতার জন্য ঐক্যবদ্ধ লড়াই আর না হতে পারে। এই বিপদের মুখে বামপন্থীরা চাইল গণ—আন্দোলনের চাপ দিয়ে সরকারকে নতি স্বীকার করানো, কারণ আসন্ন যুদ্ধের আবহাওয়ায় ব্রিটেনের উপর চাপ দিলে তাতে কাজও হবে। অপরদিকে দক্ষিণপন্থীরা এই অবস্থায় ব্রিটেনকে বিচলিত করতে রাজী নয়, অথচ যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো চাপিয়ে দেওয়া হলে কী ব্যবস্থা নিতে হবে তাও ঠিক করতে পারছে না। কিছুদিন প্রশাসনিক ক্ষমতা ভোগ করার পরে তারা আর গণ—অন্দোলনের পথে যেতে রাজী নয়; বদলে ব্রিটিশের সংগে একটা রফায় আগ্রহী। কাজেই বামপন্থীদের আক্রমণাত্মক ভূমিকা ক্রমেই তাদের কাছে অস্বস্তিকর হ'য়ে উঠছিল, আর এর ফলে দলের আভ্যন্তরীণ ক্ষমতা পুরোপুরিভাবে নিজেদের হাতে নিয়ে আসবার একটা চেষ্টা শুরু হ'ল, যার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে নেতাজী এবং বিদ্রোহের সমাধি রচনা হ'ল ত্রিপুরীতে।

হরিপুরা থেকে ত্রিপুরী এই এক বছরে দলের ভিতরে সুভাষ শত্রু বাড়াতে লাগলেন। সেপ্টেম্বরে মিউনিখ অ্যাক্ট হয়ে যাবার পর সুভাষ ভারতীয় জনগণকে এক আসন্ন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে খোলাখুলি প্রচার শুরু করায় মন্ত্রীত্ব বা পরিষদীয় কাজের সংগে যুক্ত দক্ষিণ—পন্থীদের অনেকে অসন্তুষ্ট। এ ছাড়া জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরোধী করে সুভাষের বিবৃতিও দক্ষিণপন্থী সদস্যদের মধ্যে রীতিমত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। ফলে ত্রিপুরী অধিবেশনের মুখে কংগ্রেস সুভাষের পুনর্নির্বাচন বন্ধ করবার জন্য দক্ষিণপন্থী সীতারামাইয়াকে মনোনীত করল (যদিও এর আগেই পর পর দুবছর নেহরু সভাপতিত্ব করেছেন)। সুভাষ নিজে সভাপতি হতে চান নি। তিনি চেয়েছিলেন কংগ্রেস নরেন্দ্র দেবের মত একজন বামপন্থীকে সভাপতি করুক, যিনি আগামী বছরে সম্ভাব্য আপোষ রফায় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর আন্তরিক বিরোধিতা করবেন। কিন্তু যখন এ বিষয়ে তাঁর বারম্বার অনুরোধ নিষ্ফল হল তিনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন ও সভাপতি নির্বাচনে পট্টভীকে পরাজিত করে জয়ী হলেন।

গান্ধীজী এর আগে দুবার কংগ্রেসের সংকটে নিজে এগিয়ে এসে সমস্যার জট খুলে দিয়ে দলের সুস্থতা ও অগ্রগতি বজায় রেখেছেন (১৯২৪,১৯২৯)। কিন্তু এবারে তাঁর ভূমিকা দুর্বোধ্য ও দুর্ভাগ্যজনক। গান্ধীজী পট্টভীর পরাজয়কে তাঁর ব্যক্তিগত পরাজয় বলে ও 'সংখ্যালঘু' —দের দল ছেড়ে বেরিয়ে আসবার অনুমতি দিয়ে বিবৃতি দিলেন, আর এই বিবৃতিকে নির্দেশ হিসেবে নিয়ে ওয়াকিং কমিটি পদত্যাগ করল। এরপর গোবিন্দ বল্লভ পন্থ এক প্রস্তাব দিলেন, আগামী বছরে যেহেতু সংকটময় পরিস্থিতি হতে পারে, নতুন ওয়াকিং কমিটিকে গান্ধীজীর ইচ্ছানুযায়ী মনোনীত করা হোক। ত্রিপুরীতে প্রচন্ড গোলমালের মধ্যে পন্থ প্রস্তাব গৃহীত হল। পন্থ প্রস্তাবের মত অগণতান্ত্রিক

ও সংবিধান–বিরোধী প্রস্তাব গ্রহণের পিছনে বামপন্থীদের ভূমিকা দুর্বোধ্য, জওহরলালের মত বামপন্থী নেতার নিরপেক্ষতাও অপ্রত্যাশিত। ত্রিপুরীর ঘটনায় ক্ষুব্ধ হ'য়ে এম, এন, রায় বলেছিলেন, ''ভারতে বিপ্লবের আশা এই নর্মদাতীরে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।'' ত্রিপুরীতে কংগ্রেসের বামপন্থী শক্তি তথা ঐক্যের মেরুদন্ড ভেঙে গেল। এর পর ভাঙ্ন ও ক্ষয়ের পালা।

ঘটনা এবার সুভাষকে অনিবার্যভাবে পদত্যাগের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলল। দীর্ঘ আলোচনার পরেও ওয়াকিং কমিটি গঠনের ব্যাপারে তিনি গান্ধীজীর বিন্দুমাত্র সহযোগিতা আদায় করতে পারলেন না। অবশেষে অচলাবস্থা অবসানের জন্য ২৯শে এপ্রিল তিনি পদত্যাগ করলেন।

সুভাষের পদত্যাগের পরে দলে একনায়কী প্রবণতা বাড়তে লাগল। সুভাষ তখন বাংলার জেলায় জেলায় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ গণ–সংগ্রামের প্রস্তুতির জন্য প্রচার চালাচ্ছেন। কংগ্রেস শাসিত আটটি প্রদেশেও কৃষক সত্যাগ্রহের প্রস্তুতি চলছে। এটা বন্ধ করবার জন্য এ–আই–সি–সি, জুন মাসে সিদ্ধান্ত নিল, প্রশাসনিক বিষয়ে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিগুলি ক্যাবিনেটের কাজে নাক গলাবে না, আর নীতি নিয়ে মতপার্থক্য হ'লে বিষয়টি সংসদীয় বোর্ডে পাঠাতে হবে, খোলাখুলি আলোচনা চলবে না। দলকে সরকারের অধীনে নিয়ে আসবার এই ব্যবস্থায় ব্যাপক ক্ষোভ দেখা দিল ও স্বভাবত:ই বিক্ষোভ আন্দোলনের নেতৃত্ব এসে পড়ল নেতাজীর উপর; এর পর শৃংখলাভংগের অভিযোগে গত বছরের কংগ্রেস সভাপতি কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হ'লেন।

তবুও সুভাষ হাল ছাড়েন নি। 'ফরোয়ার্ড ব্লক' গঠন করে দলের ভিতরকার অগ্রগামী বাম উপাদানগুলিকে সংহত করার কাজে হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু এ কাজে বেশীদূর অগ্রসর হবার আগেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনায় সুভাষ বন্দী হলেন। তার পরের অধ্যায় গল্পের থেকেও আশ্চর্য।

পরবর্তী দিনে ৪২–এর 'কুইট ইন্ডিয়া' আন্দোলনের মাধ্যমে কংগ্রেসকে সুভাষের নির্দেশমত আপোষহীনতার পথেই শেষ পর্যন্ত আসতে হল। কিন্তু ততদিনে তিনি দেশের বাইরে, যুদ্ধের দাবা নলের মধ্যে।

তাঁর আপোষহীন লড়াই–এর জন্য সুভাষকে কংগ্রেস থেকে সরে যেতে হয়েছিল; কিন্তু কংগ্রেসে তিনি একটা গতি সঞ্চার করে দিয়ে গিয়েছিলেন যার ফল ছিল সুদূর প্রসারী। কংগ্রেসের মধ্যে তিনি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির সমন্বয়ে এক সার্বিক স্বাধীনতার চিন্তা রোপণ করে গিয়েছিলেন, যা পরবর্তী দিনে কংগ্রেসের স্বীকৃত মতাদর্শ হয়েছে। যে সময়ে কংগ্রেসের প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রীরা কম বেশী সবাই (জহরলাল সহ) মার্ক্সবাদী সে সময়ে নেতাজী মার্ক্সবাদ পেরিয়ে এসে ভারতীয় মাটিতে এক নতুন সমাজতন্ত্রের রূপ কল্পনা করেছিলেন, যেখানে রাজনৈতিক–অর্থনৈতিক সামাজিক সব অর্থে স্বাধীনতা বিরাজমান। স্বাধীনোত্তর কংগ্রেসের পরিকল্পিত অর্থনীতিকেও একটা ভিত্রি উপর প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন তিনি প্রথম জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন প্রতিষ্ঠা করেন। নেতাজীর আর্থ রাজনীতক ধ্যানধারণা নানা দিক প্রসঙ্গান্তরে আলোচ্য। কিন্তু কংগ্রেসের বিবর্তনের পিছনে এই নির্ভীক, দূরদর্শী ও প্রতিভাবান সংগঠকের অবদান শ্রদ্ধার সংগে স্বীকার্য।